অনিমা চিত্রমন্দিরের

চির দিনের

উত্তম·সুপ্রিয়া

অভিনীত

অনিমা চিত্র মন্দিরের নিবেদন

চির দিনের

প্রযোজনা—**অনিমা মল্লিক** ★ চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—**অগ্রদূত**

কাহিনী ও গান : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার • **চলচ্চিত্রায়ণ :** বিভূতি লাহা

সংগীত পরিচালনা—**ডাঃ নচিকেতা ঘোষ।**

প্রধান চরিত্রে : **উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী**

সহ-ভূমিকায় : সুমিতা সান্যাল, কমল মিত্র, বঙ্কিম ঘোষ ও নবাগত **অরূপ বিশ্বাস**

অন্যান্য চরিত্রে : অ্যালাষ্টিয়ার গার্ডেন। সলিল দত্ত। মৃণাল মুখোপাধ্যায়। রূপক মজুমদার। মলয়কুমার। অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য। শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়। শক্তি মুখোপাধ্যায় গোপাল দে। শম্ভু ভট্টাচার্য। অনিল ভট্টাচার্য। মণি সিংহ। সুধাংশু গুপ্ত। শৈলেন গাঙ্গুলী। কিরণময় লাহিড়ী। ধীরেন কুণ্ডু। অমিয় দাস। রাম ভট্টাচার্য্য। শুভ্রেন্দু সেনগুপ্ত, সুবল দত্ত। সুনীল দাশগুপ্ত। জ্যোতির্ময় ব্যানার্জি। নিমাই দত্ত। গীতা দে। জয়শ্রী সেন। কুমারী ইন্দ্রাণী। শুভ্রা নাগ।

শব্দানুলেখন—সুশীল সরকার। শব্দ-পুনর্যোজনা—শ্যামসুন্দর ঘোষ। চিত্র সম্পাদনা—বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। শিল্প নির্দেশনা—সত্যেন রায়চৌধুরী। ব্যবস্থাপনা—রমেশ সেনগুপ্ত রূপ-সজ্জা—বসির আমেদ। পরিচয়পত্র লিখন—দিগেন ষ্টুডিও। স্থিরচিত্র—এড্‌না লরেন্‌জ।

সহযোগিতায় : চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—**দেবাংশু মুখোপাধ্যায়।** পরিচালনা—**সুভাষ মুখোপাধ্যায়।** চলচ্চিত্রায়ন—বৈদ্যনাথ বসাক, অশোক দাস। শব্দানুলেখন—শৈলেন পাল, বীরেন নস্কর। সম্পাদনা—রমেন ঘোষ। সংগীত—অলোক দে, জয়ন্ত শেঠ। দৃশ্যসজ্জা—জগবন্ধু সাউ। রূপসজ্জা—বটু গাঙ্গুলী। কার্তিক নস্কর। বিশ্বনাথ দাস। ব্যবস্থাপনা—সুবোধ দে, রমেশ অধিকারী, রাম মহেন্দ্র, নিমাই সাহা। আলোক নিয়ন্ত্রণ—শম্ভু ব্যানার্জী, নিতাই শীল, শৈলেন দত্ত, হরিপদ মাইতি, জগু সিংহ ও গুণনিধি লস্কা।

সুর ও ছন্দ নৃত্য-নাট্যের পরিকল্পনা ও পরিচালনা : নরেশকুমার

পাশ্চাত্য নৃত্য পরিচালনা : বব্ দাশ

ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রাঃ লিমিটেড ষ্টুডিওতে গৃহীত।

ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনায়—ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য

আর বি মেহতার তত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীজ-এ পরিস্ফুটিত।

যন্ত্র সংগীত : তবলা—**পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ।** বেহালা—ষ্ট্যানলী গোমেশ। পিয়ানো—টনি মেনজিস, ভি বালসারা। বাঁশী—অলোক দে। তবলা প্রভৃতি—রাধাকান্ত নন্দী। সানাই—আলি আহমদ এবং কমলেশ মৈত্র, মদন শেঠ, নির্ম্মল বিশ্বাস, রবি রায়চৌধুরী, ওয়াই এস মলজী, শ্যাম মুখার্জী, শুভেন দে, মাইকেল ডায়াস, অমর দত্ত, পি কেশবণ, দীনেশচন্দ্র, জে রাঘবন, এন সি বড়াল, সময় মুখার্জি, নীলকান্ত নন্দী, গোপাল মুখার্জি, এস দুবে, বিধু চক্রবর্তী, রজত নন্দী, জে কারভালো, সমীর খাসনবীশ, এ্যানটেন মেনজিস্, কানাই দাস, রবি মজুমদার, অজিত মুখার্জি, সত্য মজুমদার, জো পেরেরা, রবি পাল, রবীন গাঙ্গুলী, প্রভুদাশ বিশ্বাস।

সুর ও ছন্দ নৃত্যনাট্যে অংশ গ্রহণে : নরেশকুমার, চন্দ্রনাথ মুখার্জী, কানাই মজুমদার, সাধন সরকার, বঙ্গেশ্বর মল্লিক, পরেশ দাস, চন্দ্রনারায়ণ মুখার্জী, বটু পাল, মনোরঞ্জন সরকার, বেবী গুপ্ত, শর্বরী সেন, শ্যামলী চৌধুরী, পলি মুখার্জী, ইন্দিরা ঘোষ, শিপ্রা সরকার, বাণী সেন, জয়শ্রী ব্যানার্জী, পূর্ণিমা বোস, লীলা চৌধুরী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : কমিশনার কলিকাতা পুলিশ। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান। এন সি, ডি, সি। ফাদার এ গ্যাব্রিক্ (সারাপাই)। হসপিটাল অ্যাপ্লায়েন্সেস ম্যানুফ্যাকচারিং কোং। কে, এল, এম, রয়াল ডাচ এয়ার লাইনস। গৌর সরকার। মিসেস্ তন্দ্রা রায়চৌধুরী। মিস্ রত্নাবলী রায়। তুষার দত্ত।

প্রচার পরিচালনা—ভবানী রায়। • পরিবেশনা—**ইস্টার্ণ ফিল্মস এক্সচেঞ্জ**

কাহিনী

ইন্দ্রাণীর কাছে যেটা নতুন ও অভিনব তাপসের কাছে তাই অতি স্বাভাবিক, কারণ তাপস প্রকৃতির সংগীতের অন্তঃসলিলের সন্ধান পেয়েছে। যে বাদ্য যন্ত্রেই হাত দিক তাতেই প্রকৃতির সেই অন্তর্নিহিত সুর নানা মূর্ছনায় ঝংকৃত হয়ে ওঠে। কণ্ঠে ঝরে সুরের অবিরাম নির্ঝরিণী। পলাশপুরের এই প্রাকৃতিক পরিবেশে কোত্থেকে এসে পড়েছে তাপস, জানা নেই কারও। স্থানীয় একটি চার্চের ফাদারের কাছে সে পালিত, লালিত প্রকৃতির কোলে। পাখীর গানের সাথে গলা মিশিয়েছে। ঝর্ণার সুরে সুর বেঁধেছে। বাতাসের ভেলায় ভর করে সেই সুরকে ভাসিয়ে দিয়েছে অনন্তের পানে। তাপসের গানে প্রকৃতির আহ্বান শুনতে পেল ইন্দ্রাণী। মনে হ'লো সেই গানে যেন রয়েছে প্রকৃতির ঔদার্য্য আর সাগরের গভীরতা।

ধনী শিল্পপতি শিবনাথের মাতৃহীনা একমাত্র কন্যা ইন্দ্রাণী। লাবণ্যে রূপসী, শিক্ষায় বিদুষী, সংগীতে, নৃত্যে পটিয়সী। কিন্তু তাপসের কাছে তার এতদিনের সব শিক্ষা ম্লান হ'য়ে পড়ল। মনে হ'ল তাপসের গানের মধ্যে যেন সব শিক্ষা, সব রূপ, সব গান শেষ হয়ে এসে এক হয়ে মিশে গেছে।

পলাশপুরে কিছুদিনের বিশ্রামের জন্য এসেছিল ইন্দ্রাণী। এসে তাপসকে জানলো, আলাপ গভীর হ'লো। তাকে নিয়ে এল কলকাতায়। তাপসের মত এমন প্রতিভাধরকে লোক চক্ষুর অন্তরালে নষ্ট হতে দিতে পারে না ইন্দ্রাণী। কিন্তু সহরে এসে তার মন টেকে না। জীবনটা বন্দীত্বের বেদনায় আর্তনাদ করে ওঠে বার বার। একটা হাহাকার কেবলই ওকে নিয়ে ছুটে বেড়াতে চায়। ওর মন চীৎকার করে বলতে চায়, না, না, না, এ জীবন নয়।

অবশেষে পালিয়ে আসে তাপস, তার সেই চিরপরিচিত চিরনূতন কুঞ্জবনাচ্ছাদিত পলাশপুরে। ছুটে এল ইন্দ্রাণী, তাপসকে চিরতরে বেঁধে রাখতে চায় সে।

বিয়ে করলো ওরা, তারপর কয়েকদিনের রাস, এবং সবশেষে ঘটলো বিপর্যয়। শিবনাথ সব জানতে পেরে তাঁর আত্মাভিমানে প্রচণ্ড ঘা খেলেন। মেয়েকে নিয়ে এসে বন্দী ক'রে রাখলেন। তাপসকে তাড়িয়ে দিলেন বাড়ী থেকে।

তাপসের কল্পনাপ্রবণ উদাসীন শিশুমনের উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেল। বিশাল পৃথিবীর বিপুল জনস্রোতে কোথায় যে হারিয়ে গেল কেউ তার সন্ধান পেলে না। এদিকে ইন্দ্রাণীও কেঁদে কেঁদে দৃষ্টিশক্তি হারালো। যথাসময়ে একটি পুত্র জন্মালো, নাম হ'লো কিশোর।

বড় অদ্ভুত মানুষের মন। যে বেদনাকে প্রথমে সহের অতীত ব'লে মনে হয়, কিছুদিন পর কোন একটি সান্ত্বনাকে আঁধার ক'রে সেই অসহ বেদনাকেই সহ ক'রে নেয় মানুষ—ইন্দ্রাণীও কিশোরের মধ্যেই তার সান্ত্বনার মাধুরীকে খুঁজে পেল।

কিশোর উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে তার মা-বাবার সাংগীতিক গুণগুলো। বড় হ'য়ে পেলো দাদুর ব্যবসার গুরুদায়িত্ব। মার কাছ থেকে বাবার গল্প শুনে শুনে মন তার তাঁকে দেখবার জন্য আকুল হ'য়ে ওঠে।

ঘুমকার একটি সন্ধ্যা, বাংলোয় বসে কিশোর পিয়ানো বাজাচ্ছিলো। বাজাচ্ছিলো তার বাবারই দেওয়া একটি সুর। হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ ক'রে জানালার কাঁচ ভেঙ্গে একটা ইঁটের টুক্‌রো এসে পড়লো ঘরে। তারপরই একটা পাগলাটে ধরণের লোকের আবির্ভাব। মুখ ভর্তি দাড়ি, চোখে বন্য অথচ ক্লান্ত দৃষ্টি।

লোকটি বললো, কে তোকে এ সুর শিখিয়েছে? ভুল সুর।

কিশোর হয়তো সুর ঠিকই বাজাচ্ছিলো; কিন্তু তার বাজনায় প্রাণ ছিল না, যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'তো তার বাবার বাজনায়।

ফিরে এলো কিশোর তার ক'লকাতার বাড়ীতে। একদিন কাজ থেকে ফিরে এসে দেখে সেই পাগলাটে ধরণের লোকটি কেমন ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের বাড়ীর সামনে। তাকে হাতে ধরে ঘরে নিয়ে এলো—ঠিক যে ঘরে তাপসের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলো সাজানো ছিল।

মুহূর্তের মধ্যে সেই লোকটি যেন অন্য মানুষ হ'য়ে গেল। পিয়ানোয় বসে ঝড়ের মত একটা সুর বাজাতে লাগলো, যেন তার বোবা যন্ত্রণা মূর্ত হ'য়ে ফুটে উঠছে সুর তরঙ্গে।

কিশোরের মনে হাজার প্রশ্ন। কে এই মানুষ? ঘুমকার লোকেরা বলেছিলো লোকটির নাম নাকি রঘু। কিন্তু কে এই রঘু, কেন সেদিন ঢিল ছুঁড়ে তার বাজনা বন্ধ করতে চাইছিলো? কি ক'রেই বা তার বাবার তৈরী সুর অবিকল বাজিয়ে যাচ্ছে?

কিশোর ডেকে পাঠালো মাকে, ইন্দ্রাণী ছুটতে ছুটতে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

এ কে বাজায়? কে এমন মধুর ক'রে, এমন ব্যথার মাধুরীতে ডুবিয়ে সেই অতীত দিনের সুরগুলো বাজাচ্ছে? হায়, ইন্দ্রাণী তাকে দু'চোখ ভরে দেখবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। দু'চোখ বিস্ফারিত ক'রে কেবল অন্ধকারই চোখের সামনে ভাসে। সেই অন্ধকারের মধ্যে তার অতীত দিনের মধুর ছবিগুলি ভেসে উঠছে, হারিয়ে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে.....

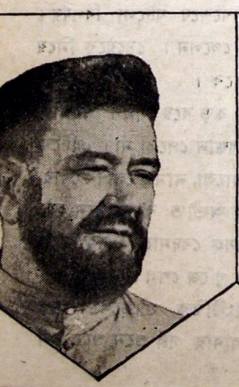
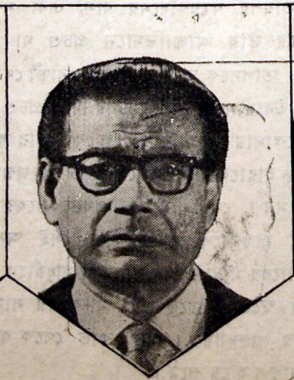

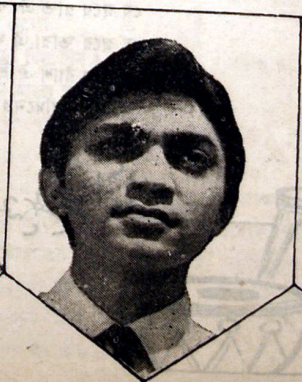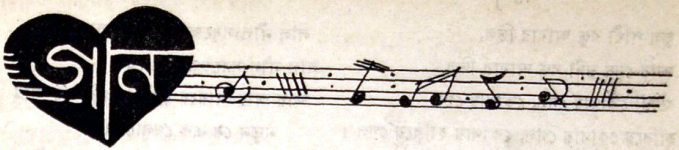

[১]

আমি অভিসারে যাবো,
আমি যাবো অভিসারে,
ধূপের ধোঁয়াতে মোর অলক শুকায়ে নেব
সাজাতে কবরী ফুলহারে।
একটি অশ্বত্থ পাতা প্রদীপের শিখে আমি ধরিব,
তার কিছু কালি ওগো কাজল করিয়া
চোখে পরিব,
আর বাকি কালি অঙ্গে মাখিয়া আমি
কলঙ্কিনী হব অহঙ্কারে।
যদি গিয়ে দেখি সে ঘুমায়ে পড়েছে
তারে জাগাবো না ডেকে,
আঁখি পল্লব তার কপোলে বুলায়ে
সোহাগ দেব যে আমি এঁকে।
নীরব বাঁশীটি তার হাতে
তুলে দেব সুরে ভরিয়া,
শ্যাম হয়ে আমি তারে ডাকিব যে
তারি নাম ধরিয়া একই সাথে
এবার দুটি নাম একই সুরে
বলিতে শেখাবো আমি তারে।

[২]

মানুষ খুন হলে পরে মানুষই তার বিচার করে
নেই ত' খুনীর মাফ,
তবে কেন পায় না বিচার নিহত গোলাপ।
বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে নেওয়া নিহত গোলাপ।
চেয়ে দেখ গোলাপটার ঐ
বুকটা চিরে রক্ত ঝরে,
আহা কেউ ছোরা মেরে পালিয়ে গেছে
কোন গোয়েন্দা তাকে ধরে।
খুন করে ত' খুনীর মনে হয় না অনুতাপ।
খুন করলে আদালতে খুনীর যে হয়গো ফাঁসি,
যারা ফুলদানীতে গোলাপ রেখে
আদায় করে তার হাসি--
তারাই যে সব পুণ্য করে
নেই যে তাদের পাপ।

[৩]

ফুল পাখী বন্ধু আমার ছিল,
আর মেঘ নদী বন্ধু আমার ছিল,
তারা কোথায় গেল, কোথায় গেল
হারিয়ে কোথায় গেল, কোথায় হারিয়ে গেল।
চাঁদ তারা বন্ধু আমার ছিল,
আর ঝর্ণা পাহাড় বন্ধু আমার ছিল
কোথায় বা সেই সোণা রোদের দিন,
কে জানে গো কেমন করে
কাটছে ওদের দিন।
কে সে আমায় অমন করে
কেড়ে যে আজ নিল,
ওরা সব কোথায় গেল।
কোথায় বা সেই
জোনাক-জ্বলা রাত—
ওদের সাথে সুখ দুঃখের
গল্প বলা রাত,
তবে কি গো ওরা আমায়
পর করে আজ দিল,
ওরা সব কোথায়
গেল॥

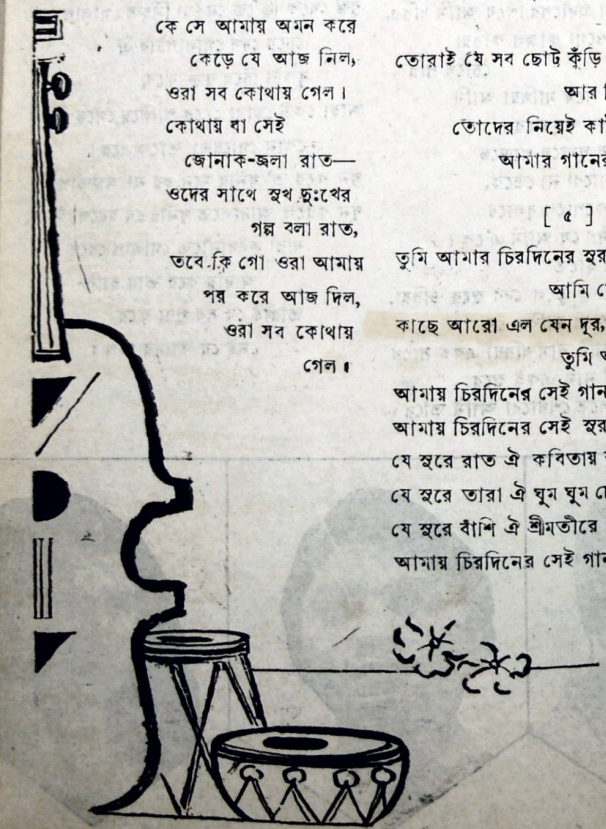

[৪]

লাল নীল সবুজের মেলা বসেছে—
লাল নীল সবুজের মেলারে
আয় আয় আয়রে ছুটে খেলবি যদি আয়
নতুন সে এক খেলারে।
বেলুন চড়ে চল চলে যাই রূপ কথারই রাজ্যে,
পায়রা ভুতুম হুতুম পেঁচা সঙ্গে যাবে আজ যে।
হাঁইয়ো হাঁই আয়রে ভাই,
ভাসাই মেঘের ভেলারে।
যদি মানুষগুলো ফুল হ'ত রে,
মজা হ'ততাই না
তোরাই যে সব ছোট কুঁড়ি
আর কিছু ত' চাই না।
তোদের নিয়েই কাটুক না হয়
আমার গানের বেলারে

[৫]

তুমি আমার চিরদিনের সুর,
আমি তোমার চিরদিনের,
কাছে আরো এল যেন দূর,
তুমি আমার চিরক্ষণের।
আমায় চিরদিনের সেই গান বলে দাও,
আমায় চিরদিনের সেই সুর বলে দাও।
যে সুরে রাত ঐ কবিতায় কথা বলে
যে সুরে তারা ঐ ঘুম ঘুম চোখে জ্বলে—
যে সুরে বাঁশি ঐ শ্রীমতীরে ডাকে আয় আয়,
আমায় চিরদিনের সেই গান বলে দাও—
আমায় চিরদিনের সেই সুর বলে দাও।
যে সুরে জীবনের স্বরলিপি লেখা আছে,
যে সুরে মমতায় ছুটি মন আসে কাছে
যে সুরে ঝরা ফুল দেবতার পায় ঠাঁই পায়
আমায় চিরদিনের সেই গান বলে দাও,
আমায় চিরদিনের সেই সুর বলে দাও॥

[৬]

পাখীদের ভাষা কাকলি
ভ্রমরের ভাষা গুঞ্জন,
বিধাতার ভাষা সংগীত
তারই সুরে কথা বলে মন॥

★

কণ্ঠ সংগীতে—

মান্না, দে, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ দত্ত, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, ইলা বসু।

[৮]

এক থেকে দুই হয়, দুই থেকে তিন
কিশোর থেকে যৌবন এলো
তা ধিনা ধিন্ ধিন্॥
ফুলে ফুলে মৌ হয় মনে বাজে বীণ॥
ঢেউ ঢেউ পাহাড়ে রং রং বাহারে,
দোল দোল আহারে সে কি জানো না
মেঘ মেঘ বেলাতে মন মন খেলাতে
চাই সুর মেলাতে সে কি জানো না?
বৃষ্টিতে মিষ্টি যে লাগে সারাদিন॥
দুই থেকে এক হয় বল দেখি কিসে?
দুটি মন এক হয়ে যায় যেই মিশে।
তখনই তো মনটা যে হয় উদাসীন॥

[৭]

লো লো লো লো লো
ঘূর্ণি ঘূর্ণি ঘূর্ণি ঘূর্ণি—হো-ও-ও
রিনিক ঝিনিক বোলে বোলে
নূপুর যে ঐ দোলে দোলে,
আগুনে যে জ্বলে জ্বলে অঙ্গ জ্বলে যায়।
উঁহুঁ উঁহুঁ উঁহুঁ উঁহুঁ উঁহুঁ
(আহা) দুষ্টু চোখে মিষ্টি হাসি,
ওযে বড়ই সর্বনাশী,
সাপুড়িয়ার বিষের বাঁশী ছোবল মারে গায়
সো সো কোয়ে ডমরে না না
ডম ডমতে ডমরে না না হো
(আরে) নাহা নাহা নাহা নাহা নাহা
নাহা নাহারে নাহা
নাহারে প্রীতম না।
ধোরনা আঁচল ধোরনা,
দোহাই তোমার না আমাকে
বারণ ফোরনা,
দোহাই তোমার না ধোরনা
আঁচল ধোরনা.
কি বলবে লোকে সে কি জানো না
আমার লজ্জা করে সে কি মানো না॥
মেঘ কালো খোঁপাটি পিঠে
ঐ ভেঙে পড়েছে,
চোখ দুটো ফুল ভেবে
ভোমরাটা যে ভুল করেছে॥
(আরে) না না না না না
নারে না
না রূপসী না এ বুকে দাগা দিও না,
দোহাই তোমার না এ মন কেড়ে নিও না,
তুমি চাও কি শুধু এই যে ফাগুনে,
আমি জ্বলে মরি পিরীত আগুনে॥

ইষ্টার্ণ ফিল্ম একসচেঞ্জ ৩নং সাকলাত প্লেস হইতে প্রকাশিত ও চিত্রালী প্রেস।
রূপ-মঞ্চ প্রকাশিকা। ৮১, বিধান সরণি, কলিকাতা—৪ থেকে মুদ্রিত।